Rs. 2.00
মূল্য ঃ ২ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : IX Issue : II, 15th, May, 2020 জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

সম্পাদকীয়

গত সংখ্যায় ছিল দুঃসময়। এবার চরম দুঃসময়। কারণ 'করোনা অতিমারী'র সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চার ঘণ্টার নোটিশে লকডাউনের অপরিণত সিদ্ধান্ত এবং শতাব্দী-ভয়াল (১৮৬৪-এর ৫ অক্টোবরের পর) ২০ মে-এর দুপুরের আমপান ঝড়। লকডাউন কেড়ে নিয়েছে খেটে-খাওয়া মানুষের/ছোট ব্যবসায়ীর রুটি-রুজি আর আমপান গ্রামীণ অর্থনীতি ধ্বংস করে দিয়েছে। শুরু হয়েছে স্বাধীন ভারতে অভূতপূর্ব শ্রমিক লং মার্চ। সব হারিয়ে পদব্রজে বা সাইকেলে হাজার হাজার মাইল পেরিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরার প্রয়াস। যে অসংখ্য পরিযায়ী শ্রমিক এই যাত্রায় প্রাণ হারিয়েছেন এবং আমপানে মৃত সবার উদ্দেশ্যে আমরা শোক জ্ঞাপন করছি।

সীমিত সাধ্য নিয়ে আমরা ১৭ মে, রবিবার স্থানীয় বস্তি অঞ্চলে লকডাউনে বিধ্বস্ত নরনারীকে ত্রাণ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আশা রাখি, আপনাদের দানে সমৃদ্ধ হয়ে ভবিষ্যতে আরো কিছু করতে পারব।

ভালো থাকুন, ঘরে থাকুন, বই পড়ুন, গান শুনুন, প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটান। মনের কথা আমাদের বলুন।

সবাইকে একসাথে নিয়ে এগুতে হবে

পেলব মুখার্জী

সবেমাত্র রাজ্যব্যাপী বয়স্কদের সম্মেলন শেষ হয়েছে। আমরা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার কাজে হাত দিয়েছি। কেন্দ্রিয় সরকার ও রাজ্য সরকারের কাছে চিঠি জমা দেবার কাজ শেষ করে নবান্নে ডেপুটেশন দেবার প্রস্তুতি শুরু করেছি। এই সময়েই নেমে এল বিপর্যয়। সারা দেশব্যাপী লকডাউন শুরু হল। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা আর করা গেল না। অফিস-আদালত বন্ধ। টেলিফোন ছাড়া আর কোন হাতিয়ার আমাদের নেই। গণপরিবহন বন্ধ, ট্রেন চলছে না— বিমান পরিষেবা বন্ধ। কিছুই খোলা নেই। বাড়ি থেকে বেরোনোর বালাই নেই। ঘরে বন্ধ। বাজার দোকান কিছুই যাবার উপায় নেই।

আমরা প্রায় প্রতি মাসেই কিছু না কিছু প্রোগ্রাম করে থাকি। রাজ্যব্যাপী সম্মেলন ছাড়া আর কিছুই এবার করা হয়নি। মার্চ মাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম হল আমাদের প্রয়াত সভাপতি বিমল চ্যাটার্জি ও মহান শ্রমিকনেতা হরিদাস মালাকারের স্মরণ দিবস পালন অনুষ্ঠান। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ও বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের জন্মদিন, সংগঠনের বাৎসরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। সমগ্র লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। শুধু করোনার চিন্তায় বিভোর সবাই।

এখন আনলক পরিস্থিতি। একটা বিষয় পরিস্কার যে করোনা চলবে। যাবে না। করোনাকে নিয়েই চলতে হবে। কবে এর ভ্যাকসিন বাজারে আসবে জানা নেই। ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে চলতে হবে। পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হবে কেউ জানে না। সবাইকে নিয়ে চলতে হবে। সবাইকে সচেতন ভাবে চলতে হবে। করোনার বিরুদ্ধে হতাশ না হয়ে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে সবাই। আমাদেরও তা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

সবাই এটা বুঝেছেন বলা যায় না, তবে আশার কথা ঘরে বসেও করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সবাই দাঁড়াচ্ছে। আমাদের প্রচেষ্টায় করোনায় যারা আক্রান্ত হয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন তাদের সাহায্য করতে অনেকে এসেছেন, সাহায্য করেছেন। বেঙ্গল ল্যাম্প বস্তি এলাকায় কর্মসূচীতে সামিল হয়েছেন মানুষের এই দৃঢ়তা আমাদের বুঝতে হবে। বয়স্ক মানুষদের সংক্রমণের আশঙ্কা/বিপদ বেশি জেনেও যারা এগিয়ে এসেছেন তাদের জানাই আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন। এভাবেই এগুবে জীবন — করোনাকে পরাস্ত করে জয়ের পথে এগিয়ে যাবো এ বিশ্বাস নিয়ে আসুন আমরা এগিয়ে চলি জয়ের পথে। সকলে ভালো থাকুন। সুস্থ থাকুন। এগিয়ে চলুন।

আমাদের বিদ্যাসাগর (২য় পর্ব)

গৌতম রায়চৌধুরী

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

বিদ্যাসাগরের রসিকতার কথা 'অমৃত সমান', বলে শেষ করা যাবে না। আমরা বরং ঘরোয়া, মজলিসি, স্নেহপ্রবণ বিদ্যাসাগরকে নিয়ে আলোচনা করব।

শৈশবে বিদ্যাসাগর শুধু একগুঁইয়া নয় বড় দুষ্টও ছিলেন। পাড়ার লোকের বাগানের ফল চুরি করে খেতেন। তাঁর প্রিয় খেলা ছিল কপাটি। কপাটির পর প্রিয় ছিল কুস্তি। কুস্তি এত ভালোবাসতেন যে সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষ থাকাকালীন মালীর ঘরের পিছনে কুস্তির আখড়া করেছিলেন। সেখানে অন্যান্য পণ্ডিতগণের সঙ্গে বিদ্যাসাগরও মহানন্দে মাটি মাখতেন। বড় হয়েও তিনি ছোটবেলার 'কপাটি'কে ভোলেননি। পরিণত যৌবনে, যখন তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ তখনও গ্রামে ফিরে কপাটি খেলায় মেতে উঠতেন। এমনকি বাড়িতে ডাকাতির পরের দিনও (১৮৫২ সালের ১১ মে রাতে ডাকাতরা সর্বস্ব লুঠ করেছিল), যখন ঘাটাল থানার দারোগাবাবু তদন্তে এসে যথারীতি দক্ষিণা চাইলেন, "বৃদ্ধের জ্যেষ্ঠপুত্র নিজের সহোদরগুলিকে ও পাড়ার যুবকবৃন্দকে লইয়া বাটির সম্মুখে সুবিস্তৃত মাঠে কপাটি খেলা আরম্ভ করিয়া দিলেন," (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৭১)। এই প্রসঙ্গে আরো একটি রসিকতার উদাহরণ আছে। ডাকাতির সময় বিদ্যাসাগর সপরিবারে পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব বিদ্রুপ করে তাহাকে কাপুরুষ বলেন। বিদ্যাসাগর উত্তর দিলেন —"আপনারা মজার লোক, প্রাণ লইয়া পলাইয়াছিলাম, তাতে বলিলেন 'কাপুরুষ' আর ৪০/৫০ জন দস্যুর সম্মুখে একা প্রাণ দিলে, বলিতেন, তাইত লোকটা বড় আহাম্মক, এত লোকের সামনে একা এগুয়ে মিথ্যা মিথ্যা প্রাণটা দিলে! আপনাদের মনের মত কাজ করা কঠিন, এগুলেও দোষ, পেছুলেও দোষ।" (চণ্ডীচরণ, পৃ. ২৭২)

বিদ্যাসাগর, পিতা ঠাকুরদাসকে দেবতার অধিক শ্রদ্ধা করতেন। তবু উচিত কথা বলতে পিছপা হতেন না। তবে তাও রসিকতায় পরিপূর্ণ। ঠাকুরদাস তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ঈশানচন্দ্র এবং জ্যেষ্ঠপৌত্র (বিদ্যাসাগরের পুত্র) নারায়ণচন্দ্রকে এতটাই ভালোবাসিতেন যে তারা অন্য কারোর

কথা শুনত না। বিদ্যাসাগর এই প্রসঙ্গে ঠাকুরদাসকে বলেছিলেন — "আপনি কি নিরামিষাশী? আপনি দুটিবেলা ঈশান ও নারায়ণের মাথা খাইতেছেন। তবুও আপনি নিরামিষাশী?" (চণ্ডীচরণ, পৃ. ২৭৯)

দরিদ্র ঠাকুরদাসের ছেলে নিজ চেষ্টায় বিশাল পরিবারটিতে আর্থিক সমৃদ্ধি দিয়েছিলেন। একান্নবর্তী পরিবারের অশান্তির আশঙ্কায় ভাইদের পৃথক গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করেছেন। এমনকি দরিদ্র ও অসহায় ছাত্রদের জন্যও আলাদা বন্দোবস্ত করেছিলেন। "কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, বহু অর্থ ব্যয় করিয়াও তিনি কিছুতেই পারিবারিক শান্তি স্থাপনে সফল মনোরথ হইতে পারেন না। ... বিদ্যাসার মহাশয় সহোদরদিগকে অত্যন্ত ভালোবাসিতেন এবং সর্বদা তাঁহাদের এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গের সুখ চিন্তা করতেন। কিন্তু সহোদরেরা যে তাঁহার প্রতি সর্বদা সমুচিত ভ্রাতৃভাবাপন্ন ছিলেন, এরূপ বোধ হয় না।" (চণ্ডীচরণ, পৃ. ২৮৪)

এর চেয়েও মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। যে 'বিধবাবিবাহ' প্রচলন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি, সেই বিধবাবিবাহের জন্য বিদ্যাসাগরকে প্রাণাধিক প্রিয় বীরসিংহ গ্রাম ত্যাগ করতে হয়। ক্ষীরপাইনিবাসী ক্ষুদিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহিনী নামে এক বিধবার বিবাহে বিদ্যাসাগর প্রথম সম্মতি জানালেও, পরবর্তীকালে ক্ষীরপাই গ্রামের সম্ভ্রান্ত কিছু ব্যক্তির অনুরোধ বিবাহে আপত্তি জানান। কিন্তু তাঁর সহোদর শম্ভুচন্দ্রের প্রশ্রয়ে ওই বিবাহ সম্পন্ন হয়। তিনি এত দুঃখ পেয়েছিলেন যে দেশত্যাগী হলেন। জীবনে আর কখনো বীরসিংহে যাননি। কলকাতা আসার সময় "সহোদরদিগকে ও সম্ভ্রান্ত গ্রামবাসীদিগকে বলিয়া আসিলেন 'তোমরা আমাকে দেশত্যাগী করাইলে।" (চণ্ডীচরণ, পৃ. ২৯১)

তাঁর জীবনব্যাপী নানাবিধ দুঃখকষ্টের মধ্যে গুটিকতক সুখের অন্যতম ছিল শেষ বয়সে কলকাতার বাদুড়বাগানের বাসায় মেয়েরা ও তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভরপুর সংসার। সে বড় সুখের সময়। বিদ্যাসাগর তখন নাতি-নাতনীদের আদরের দাদু। প্রায় সন্ধ্যাতেই গল্পদাদুর আসর জমে উঠত। মেয়েরা এবং নাতি-নাতনীদের নিয়ে বিদ্যাসাগর গল্পে মেতে উঠতেন। সবাই তাঁর মুখের 'চর্বিত তাম্বুল'-এর উমেদার ছিলেন। পর্যায়ক্রমে বিদ্যাসাগর প্রসাদি দিতেন, আর বলিতেন — "আচ্ছা, এতটু বিলম্ব কর, পানে সম্বরা দিই। তাহার অর্থ এই যে পান খাইতে খাইতে একবার তামাক খাইতে হইবে।" (চণ্ডীচরণ, পৃ. ৩০৮)

এই আসরের আর একটি মজার ঘটনা আছে। সবচেয়ে ছোট নাতি গুজে (রামকমল) তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল। তাকে উপহার দেওয়ার জন্য তিনি নতুন সিকি, দুয়ানি, আধুলি প্রভৃতি এনে রাখতেন। রামকমল চাইবামাত্র তাকে দিতেন এবং জিজ্ঞাসা করিতেন, — "দাদা, তুমি কাকে ভালবাস? শিশু বলিত, "দাদামশাই, তোমাকেই ভালবাসি, আর তোমার চেয়ে তোমার ঐ নূতন নূতন সিকি দুয়ানীকে বেশী ভালবাসি।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন, "সকলেই তাই করে, তবে তুমি বোঝ না তাই বলে ফেল, অন্যেরা ও কষ্ট স্বীকার করে না।" (চণ্ডীচরণ, পৃ. ৩০৮)

দৌহিত্রদের নিয়ে আর একটি রসিকতা। "বিদ্যাসার মহাশয়ের উপক্রমণিকাতে শব্দরূপের উদাহরণস্বরূপ 'নর' শব্দের উল্লেখ ছিল। পরে উহা পরিবর্তিত হইয়া 'গজ' শব্দে পর্যবসিত হয়। সুরেশ সমাজপতি (দৌহিত্র) ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় হাস্য করিয়া উত্তর দেন, 'মনে করিয়াছিলাম, তোরা দুই ভাই নর। এখন দেখছি তোরা নর নয়, তোরা দুটি গজ"। (শঙ্করীপ্রসাদ বসু, পৃ. ৩১৯)

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন, "বিদ্যাসাগরকে সকলেই দিগ্‌গজ পণ্ডিত বলিয়াই জানেন, কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সহিত মিশিতে পাইয়াছিলেন, তাঁহারা জানেন যে, তাঁহার কথাবার্তায় হাসি-তামাসার কি একটা অদ্ভুত শক্তি ছিল।" (করুণাসাগর বিদ্যাসাগরে উদ্ধৃত, পৃ. ৩৩৯)। এই শক্তির পরিচয় পাওয়া যাবে কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের বর্ণনায় — একবার এক বড় মানুষের বাড়িতে নিমন্ত্রণ। সঙ্গে আছেন দীনবন্ধু মিত্র। কিন্তু

রান্নার খুব দেরী হচ্ছে দেখে অনেকেই কেটে পড়বার তাল করছেন। বাধ্য হয়ে নিমন্ত্রণকর্তা বিদ্যাসাগরকে কোন প্রকারে ভদ্রলোকদের আধঘণ্টাখানেক আটকে রাখতে বললেন। বিদ্যাসাগর দীনবন্ধুকে বললেন— দীনবন্ধু, আমি একটা করে গল্প বলব, আর তোমাকেও আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে। শুরু হল গল্প বলা। সবাই মন্ত্রমুগ্ধ। ইতিমধ্যে রান্না শেষ, পাত পড়েছে। কিন্তু কেউ আর গল্পের আসর ছেড়ে খাওয়ার আসরে যাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে গৃহকর্তার আবার আগমন এবং বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ — দয়া করে গল্প বন্ধ করুন। সহাস্যমুখে বিদ্যাসাগরের গল্পে ছেদ এবং খাওয়া শুরু। (করুণাসাগরে উদ্ধৃত, পৃ.৩৪৪)

রসরাজ অমৃতলাল বসুও একই অভিজ্ঞতা লিখে গেছেন। ঠাকুরদাসকে দেখতে বিদ্যাসাগর একবার কাশীতে গিয়ে লোকনাথবাবুর বাসায় উঠেছিলেন। তখন গঙ্গার উপর সেতু তৈরি হয়নি। শেষ রাতে নৌকা করে গঙ্গা পেরিয়ে রাজঘাট স্টেশনে বিদ্যাসাগরকে পৌঁছে দেবার ভার পড়েছিল অমৃতলাল ও তার এক বন্ধুর উপর। তাদের অনুরোধে বিদ্যাসাগর গল্প শুরু করলেন, ছোট বড় বিচিত্র রূপকথা। মাঝরাতে চুরি কিনলেন। তারপর আবার গল্প। গল্পে গল্পে রাত কাবার। (করুণাসাগরে উদ্ধৃত, পৃ. ৩৪০)

শুধু কথায় নয়, বিদ্যাসাগর যে বাস্তব জীবনেও রসিকতা, মজা বা হুল্লোড় পছন্দ করতেন তার নানা নিদর্শন আছে। আমরা মাত্র দুটি ঘটনার কথা উল্লেখ করব।

প্রথমটি অর্থাৎ ভোজনসমিতি বিষয়ে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জবানিতে শুনুন (পৃ. ৩৩৬)

''আহারাদি নিয়ে নিতান্ত আত্মীয়স্থলে এক প্রকার দৌরাত্মের ব্যবস্থা করেছিলেন। 'ভোজনসমিতি' নামে একটি ক্ষুদ্র দল গঠিত হইয়াছিল। এই সভার ৯/১০ জন মাত্র সভ্য ছিলেন। ইহারা মধ্যে মধ্যে দল বাঁধিয়া নিতান্ত আত্মীয়স্থলে উপস্থিত হইয়া খাইতে চাহিতেন। গৃহকর্তা রহস্যচ্ছলে প্রথম প্রথম কিছুই দিবেন না বলিয়া বিদায় করিতে চাহিতেন, শেষে সকলে মিলিয়া আহারাদি সমাপনান্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। একবার এক গৃহস্তকে এইরূপ পীড়ণ করিয়া একটা খুব জাঁকাল গোছের আহার জুটিল। কিন্তু পরদিন দলের একজনের (সম্ভবতঃ দ্বারিক বাবুর) পেটের পীড়া হইল। কেহ কেহ বলিলেন ইহার পেটের দোষ আছে। ইহাকে সভ্যপদ হইতে খারিজ করিয়া দাও। তদুত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, —''না হে। উহাকে খারিজ করিলে অধর্ম হইবে। যে ব্যক্তি Martyr to the cause (এই কার্য্যে প্রাণ দিতে উদ্যত) তাহাকে বিদায় করিয়া দিলে, কাকে নিয়ে থাকবে?''

দ্বিতীয় ঘটনাটিতে এক হুল্লোড়বাজ যুবকের দেখা মিলবে। মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'শ্রুতি-স্মৃতি', প্রথম ভাগে লিখেছেন ঃ 'একবার প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী মহাশয় পালকি করে শ্বশুরবাটি যাইবার সময় বিদ্যাসাগর ও ভরত শিরোমণি মহাশয় তাঁহার সঙ্গে পাইক সাজিয়া গিয়াছিলেন। কটিদেশে উপবীত গুঁজিয়া লাঠি কাঁধে করিয়া পাইকের ন্যায় চলিলেন। পহুঁছিয়া সর্বাধিকারী মহাশয়ের শ্বশুর মহাশয়কে সেলাম করিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁরা দুজন যখন বাটির পুস্করণীতে সন্তরণ করিতেছিলেন, তখন সর্বাধিকারী মহাশয়ের স্ত্রী তাঁহাদের চিনিতে পারেন। চিনিতে পারিয়া তাঁহার বাবাকে বলিলেন, তাঁহার বাবা ঘাটে আসিয়া দেখেন যে তাঁহারা একগলা জলে দাঁড়াইয়া সন্ধ্যা করিতেছেন। পাছে কেহ পৈতা দেখিতে পায় বলিয়া একগলা জলে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার বাবার সন্দেহ ঘনীভূত হইল, পাইকেরা যে সন্ধ্যাহ্নিক করে ইহা তিনি দেখেন নাই। ইনি গললগ্নীকৃতবাসে তাঁহাদের বলিলেন, ''আপনাদের চিনেছি কেন আমাদের ছলনা করছেন? আসুন আপনাদের সেবা করিয়া কৃতার্থ হই।... বিদ্যাসাগর বলিয়া উঠিলেন, ''ওরে ধরেছে রে, এত করেও পাইক হতে পারলাম না।'' (করুণাসাগরে উদ্ধৃত, পৃ. ৪৮) [ক্রমশ]

বিদ্যালয় গঠনের ইতিহাস

ছায়া মুখার্জী

ছোটবেলা থেকেই মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারত একজন আদর্শ শিক্ষিকারূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। বিদ্যালয় জীবনেও শিক্ষক/শিক্ষিকারা 'জীবনের লক্ষ্য বা কী হতে চাই' প্রবন্ধ রচনা করতে দিলেই আমি আমার ওই একটি লক্ষ্য অর্থাৎ আদর্শ শিক্ষিকা হওয়ার কথাই লিখতাম। প্রি-ইউনিভার্সিটি পড়াকালীন উইমেন্স এডুকেশন ক্যাম্পাসে হেস্টিংস হাউসে সিনিয়র টিচার্স ট্রেনিং কোর্সে ভর্ত্তির জন্য পরীক্ষা দিতে গেলাম, সঙ্গে ছিলেন আমার বড়দাদা। তখন আমি এতটাই ছোট ছিলাম যে একা একা যাতায়াত করতে ভয় পেতাম। আমি পরীক্ষা দিয়ে পাস করলাম এবং ওখানে ভর্ত্তির সুযোগ পেলাম।

শিক্ষিকা-শিক্ষণ পরীক্ষা শেষ হবার সাথে সাথে আমি রাজেন্দ্র প্রসাদ স্কুলে ইন্টারভিউ দিই। তাতে আমি একবারেই মনোনীত হই। কিন্তু বিদ্যালয়ে যে শূন্যপদ সৃষ্টি হওয়ার কথা ছিল, তা তখন বিশেষ কারণে না হওয়ায় আমার চাকরিটা হল না।

ছোটবেলা থেকেই আমরা, বোনেরা চারু এ্যাভিন্যু অঞ্চলে মানুষের জন্য নানাবিধ উন্নয়ণমূলক কাজে সহায়তা করতাম। আমরা খুবই গরীব হলেও কারোর বই কিনতে বা কারোকে বিনাবেতনে পড়াতে সাহায্য করতাম।

১৯৬৮ সালের ২৫ মার্চ, চারু এ্যাভিন্যুর সার্বজনীন দুর্গোৎসব মাঠে খেটে খাওয়া মহিলাদের নিয়ে একটা নাটক মঞ্চস্থ করলাম। এছাড়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তী করলাম। সেদিন প্রচুর মানুষ একসঙ্গে দাঁড়িয়ে এই মনোজ্ঞ এবং রুচিসম্মত অনুষ্ঠান উপভোগ করলেন।

সেদিনই আমি শ্রদ্ধেয়া দিদিদের বললাম যে শুধু এসব অনুষ্ঠান করলে চলবে না। যেসব গরীব বস্তি এলাকায় বিদ্যালয় নেই, সেখানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন নেতাজীনগর বালিকা বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক শিক্ষিকা অপর্ণা পালচৌধুরী এবং আরেকজন ছিলেন P. N. T.-এর অফিসার রেবা দত্ত। ওনারা আমার সিদ্ধান্তের তারিফ করলেন।

এবার অঞ্চলের বস্তিতে ঘুরে ঘুরে নানাবিধ কাজ করতে করতে এগিয়ে এলাম ৫৪ নং টালিগঞ্জ রোডের বিরাট বস্তিতে। অন্যান্য বস্তিগুলিতে বিদ্যালয় থাকলেও টালিগঞ্জ রোডের ঐ বস্তিতে কোন বিদ্যালয় ছিল না। বস্তি থেকে বেরিয়ে শিবরতন বিদ্যাভবন স্কুল, আর ব্রীজের ওপারে কুসুম কুমারী বিদ্যালয় ছিল। কিন্তু ঐসব স্কুলে এই অঞ্চলের শিশুদের কোনো স্থান হত না। মানুষগুলি ছিল ভীষণ গরীব। অঞ্চলে না ছিল নিকাশী ব্যবস্থা, না ছিল কোন প্রাকৃতিক কাজকর্ম করার ব্যবস্থা। আমার সঙ্গে ছিল আমার ছোট বোন ছবি ভট্টাচার্য। ও প্রচণ্ড পরিশ্রম করত। আমরা প্রথমে অঞ্চলের মানুষদের সঙ্গে মিশে গেলাম এবং জানতে পারলাম তাদের শৌচাগার, নিকাশি ব্যবস্থা, আলো এবং জল প্রয়োজন। একটি বিদ্যালয়ও দরকার। তখন আমি, আমার বোন এবং অপর্ণাদি এলাকার মানুষের উক্ত উন্নয়নমূলক কাজগুলি করতে করতে, তাদের বিদ্যালয়ের জন্য একটা জায়গা দিতে বললাম।

সেখানকার মানুষরা বলল যে আমরা বিদ্যালয়ের জন্য একটা জায়গা রেখেছি। একবার স্কুল গড়ার জন্য এসেছিল কোন এক সংস্থা। কিন্তু পরবর্তীকালে তারা আরম্ভ করেও কোনো কাজ করে উঠতে পারেনি। ইতিমধ্যে জুন মাসে আমি উক্ত বিদ্যালয়ে সকালে চাকরি পেলাম সামান্য বেতনে (অঅনুমোদিত সহকারী শিক্ষিকা হিসাবে)।

তখন একটু মনে জোর পেলাম। আমার উপার্জিত অর্থ এবং আমার বোনের টিউশানির টাকা অল্প অল্প করে খরচ করতে লাগলাম। অঞ্চলের মহিলা উষারাণী দে নিঃসন্তান ছিলেন। তার শিক্ষাগত যোগ্যতা তেমনকিছু না থাকলেও, খুবই সৎমানুষ ছিলেন। শিশুশ্রেণীর পঠন-পাঠনের দায়িত্ব তার উপরই অর্পণ করেছিলাম। পরবর্তীকালে তাকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসানোর ব্যবস্থাও হয়েছিল।

এরপর বিদ্যালয়ের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হল। কমিটিতে সভাপতি হলেন রেবা দত্ত এবং সম্পাদিকা হলেন অপর্ণা পালচৌধুরী। প্রথম সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে ছায়া ভট্টাচার্য (ট্রেণ্ড) প্রধান শিক্ষিকা, ছবি ভট্টাচার্য এবং উষা দে, সহকারী শিক্ষিকা হিসাবে সুকান্ত শিক্ষা নিকেতনে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হল। তারপর থেকে আমরা তিনজন ছাত্রছাত্রী সংগ্রহ করে শ্রেণীর কাজ চালাতে লাগলাম। বিদ্যালয়ের কোনো শ্রেণীকক্ষ, মাথার উপর ছাউনি, এককথায় কিছুই ছিল না। পাঁচ কাঠার মতো খোলা জায়গায় রেলের জমি ছেড়ে টালিগঞ্জ রোডের, মণ্ডল বাড়ীর পিছনে আমরা প্রতিদিন শ্রেণীর কার্য চালাতে লাগলাম। রেললাইনের পারে টালিগঞ্জ রোড সংলগ্ন জায়গায় ডোবা আর ঘন জঙ্গল ছিল। তাই আমাদের ঘুরে চন্দ্রমণ্ডল লেন থেকে ভিতরের সরু গলি দিয়ে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে হত। সে যে কী ভয়ানক জায়গা ছিল তা লিখে বর্ণনা দেওয়া যাবে না। কিছুদিন পর ছাত্র/ছাত্রী বেড়ে যাওয়ায় আমার দিদির বন্ধু, (তার স্বামী দূরে চাকরি করতেন) মালতী কাঞ্জিলালকে পড়ানোর অনুরোধ করলাম। আরো বললাম যে আমরা কোন টাকা-পয়সা দিতে পারবো না তবে শীঘ্র যাতে সরকারী অনুমোদন পায় তার ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর থাকবো। স্কুল গড়ার নেশা আমাকে পেয়ে বসেছিল।

অর্থ নেই, তাই নিজেদের টাকা-পয়সা খরচ করেই একটু চা-মুড়ি খেয়ে নিতাম। এছাড়া খাতা-কলম, রেজিস্ট্রি খাতা ইত্যাদি ক্রয় করে নিয়েছিলাম। কোন শ্রেণীকক্ষ নেই বলে আমি সেক্রেটারিকে চাপ দিতে থাকলাম। তারপর সিদ্ধান্ত হল যে চ্যারিটি শো করতে হবে। সেইমত ত্যাগরাজ হলে নাটক মঞ্চস্থ করা হল। এবার ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন স্থানে টিকিট বিক্রি করা অর্থ সব সেক্রেটারির কাছে জমা দিলাম। সেক্রেটারি বললেন হল ভাড়া দিয়ে অন্যান্য খরচ করে আর বিশেষ টাকা নেই। কিছু দিলে ডোনেশন তুলতে হবে। আমরা তাই তুলে দিলাম। এবার স্থানীয় লোকেদের ডেকে শাল খুঁটি ও বাঁশের খুঁটি দিয়ে দুখানা ঘরের চালা করা হল। বিদ্যালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় অঞ্চলের যুবকরা (ইয়ং স্টার এস্যোসিয়েশন) একটি দরমার বেড়া দিয়ে ঘর বানাল। আমাদের অনুরোধে তারা ঘরটি ব্যবহার করতে দিল। আমরা উক্ত ঘরে শ্রেণীর কাজ চালাতে লাগলাম।

ইতিমধ্যে আমাদের সেক্রেটারি বিদ্যালয়ের অনুমোদনের জন্য আবেদন করলেন। কিন্তু কেউ আসেনি। এরপর সম্পাদিকা আমাকে পশ্চিমবাংলার প্রাক্তন স্পীকার বিজয়কৃষ্ণ ব্যানার্জীর কাছে পাঠান বিদ্যালয়ের নির্মাণকাজে অর্থ সাহায্যের জন্য। তাঁর বিশাল বাড়ী হাজরা রোডে (বর্তমান মহারাষ্ট্র নিবাসের কাছে)। আমি একাই খুব সকালে তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করি এবং অর্থের জন্য প্রার্থনা করি। তিনি আমাকে আশ্বস্ত করলেও জানি না পরের দিন কী কারণে আমাকে উনি জানিয়ে দিলেন যে 'কোন বিদ্যালয় গড়তে আমি অর্থ সাহায্য দিতে পারবো না।' ফিরে এলাম ব্যর্থ মনোরথ হয়ে। এরপর ছায়াবানী স্টুডিয়ো থেকে ফ্রিতে 'ছেলে কার' ফিল্ম এনে মেনকা হলে, বন্ধুর দাদার থেকে ফ্রি-তে হল নিয়ে চ্যারিটি শো করা হল। অনেকে টিকিট নিলেও তার মূল্য না

দেওয়ায় একেবারেই ফ্লপ হল। তবুও হতাশ হইনি একদম। ইত্যবসরে আমার আর এক বন্ধু রেখা ভৌমিক আমাদের বিদ্যালয়ে সহশিক্ষিকা পদে যোগ দিলেন।

প্রখ্যাত এ্যাডভোকেট স্নেহাংশু আচার্য, শুনেছি উনি অনেক ভালো কাজে দান-ধ্যান করেন। সাহায্যের আশায় একদিন সকাল আটটায় তাঁর আলিপুরের বাড়িতে যাই। সমস্ত কথাবার্তা শুনে উনি কিছু সাহায্য সম্মতি প্রকাশ করলেও, কয়েকদিনের মধ্যেও ওনার দপ্তর থেকে চিঠি পাই যে এই মুহূর্তে কোন আর্থিক সাহায্য দিতে অপারগ। তাতেও আমি হতাশ হলাম না।

এদিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে মাধ্যমিক পাশ করা কোন মানুষ ছিল না। সাক্ষরই ছিলেন মাত্র চার-পাঁচ জন। ফলে আমার কষ্টের কুলকিনারা ছিল না। এরমধ্যে বেশ কিছু লোক অসামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত ছিলেন। আবার অশিক্ষিত হলেও কিছু মানুষ বেশ সৎ ছিলেন। এবার এলাকার মানুষগুলিকে শিক্ষার সাথে সংস্কৃতিপরায়ণ করে তুলতে নানাবিধ কর্মসূচী গ্রহণ করলাম। খেটে খাওয়া মানুষগুলিকে নিয়ে বিদ্যালয়ের ছুটির পর তাদের সাক্ষর করবার জন্য বয়স্ক শিক্ষার ক্লাস নিতে আরম্ভ করলাম। তারপর আবার একটা চ্যারিটি শো করার চেষ্টা চালাতে লাগলাম। এবার ইন্দিরা হল নিলাম। প্রথমে কথা হল যে হল ভাড়া লাগবে না। কিন্তু পরবর্তীকালে ম্যানেজার কিছুতেই রাজী হল না। হলের ভাড়া বাবদ তিন হাজার টাকা নিয়ে নিল। ডালহৌসী থেকে অ্যামুজমেন্ট ট্যাক্স ফ্রি করতে পেরেছিলাম। এবার ফ্রি বই পেয়েছিলাম — 'হীরের প্রজাপতি।' টিকিট সেল প্রায় সবই হয়েছিল। এখান থেকেই কিছু অর্থ দিয়ে মাথায় টালি ও দরমা দিয়ে দুখানা ঘর, দরজা-জানলা ছাড়াই, তৈরি করতে পারলাম। এবার সমানেই হাঁটাহাঁটি করতে লাগলাম নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং-এ। তারপর আমার আর আমার বোনের চেনা একজন শিক্ষকের মাধ্যমে শিক্ষা দপ্তরের একজন করণিকের সঙ্গে পরিচয় হল। আমি সেখানেই গিয়ে বিদ্যালয়ের তথ্য জমা দিয়ে আবেদন জানালাম যে যত তাড়াতাড়ি পারেন আমাদের বিদ্যালয় পরিদর্শন করানোর ব্যবস্থা করান।

এর সাথে সাথে চলতে লাগলো নানা উপায়ে অর্থ সংগ্রহের কাজ। কারণ আমরা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বেতন নিতাম না। এই ছোটাছুটিগুলি বিদ্যালয়ের অন্য কোন সহকারীরা করতে পারতো না। তারা শুধু শ্রেণীর কাজটুকুই চালাতো। তাই তাদের নিয়মিত কাজ করাটা ছিল অনিয়মিত আর আমার নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই।

অবশেষে ১৯৭০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে শিক্ষা দপ্তর থেকে হঠাৎ পরিদর্শনে একজন পরিদর্শিকা এলেন। উনি খুব খুশি হলেন বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন দেখে। তিনি আমাকে বললেন এইরকম বস্তির স্কুলই প্রথম অনুমোদন পাবে। আপনারা বিদ্যালয়ের রেকর্ড ঠিকঠাক রাখুন এবং ঘর তৈরী করুন।

কোন রেকর্ডই বিদ্যালয়ে রাখার পরিস্থিতি ছিল না। আমাদের বাড়িতে ব্যাগে করে নিয়ে যাওয়া-আসা চলতে লাগলো। এবার বাড়ি থেকে একটা টেবিল, ২টি চেয়ার এবং একটি আলমারি ও ১টি লম্বা বেঞ্চি বিদ্যালয়ে নিয়ে গেলাম। এরমধ্যে আমাদের সম্পাদিকা অপর্ণা পালচৌধুরী জানালেন যে সাউথ পয়েন্ট স্কুলের সংস্কার হচ্ছিল, তাই ওরা পুরানো বেঞ্চিগুলি কোনো স্কুলকে দিয়ে দেবে। উনি পঞ্চাশ জোড়া বেঞ্চি আমাকে ভাড়া দিয়ে আনতে বললেন। আমি সাগহ্রে তা বিদ্যালয়ে নিয়ে নিলাম। এবার ছাত্র-ছাত্রীদের বসার জায়গার আর অসুবিধা রইল না। এতদিন ওরা বাড়ি থেকে চট নিয়ে এসে বসত। [ক্রমশ]

করোনা

প্রশান্ত কুমার ধর

তুমি মোদের অচেনা-অজানা শত্রু, আতঙ্কের দিশারি,
সদা জাগ্রত তুমি, নিত্য নতুন লক্ষণ নিয়ে পরিস্ফুট হও,
তোমার রক্তচক্ষু সর্বত্র বিরাজমান, করেছ তৈয়ারী দূরত্ব,
বিষম আচরণ তোমার, নিরন্তর মর্মভেদী হাহাকার।

তুমি বড্ড চতুর, স্পর্শকাতর, নিশ্বাস বিষে ভরা জানি,
সুযোগের অপেক্ষায় থাকো, অবিরাম প্রত্যয় নিয়ে,
করছো তুমি প্রলয়নৃত্য, কত মানুষ হচ্ছে হত,
হাত ধুয়ে করছি হাজা, মুখোশ পরে অরণ্যদেব।

আত্মতুষ্টির নেই জায়গা, দূরত্বটাই আশার গান।
লড়বো মোরা এই সঙ্কটে, হাঁটু ভেঙ্গে বসে থাকবো না,
হৃদয় খুঁড়ে করবো সন্ধান, আত্মবিশ্বাস শক্তিমান।
হবে বিদ্ধ, ধরাশায়ী রাবণ, সঞ্জিবিত হবে জনজীবন।

যাঁরা জীবন বাজি রেখে, করছে লড়াই দিবারাত্রি,
ডাক্তার-নার্স-আরো অনেকে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে,
ভুলে যেন না যাই তাঁদের—,
থাকবে তাঁরা চিরদিন, মোদের অন্তরের গভীরে।

আমাদের সেবাকার্য

গত ১৭ মে, রবিবার স্থানীয় বেঙ্গল ল্যাম্প বস্তি অঞ্চলে আমাদের তরফ থেকে এক ত্রাণশিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত শিবিরে ৬০টি পরিবারকে ৫ কেজি চাল, ১ কেজি মুসুর ডাল, ১/২ কেজি সর্ষের তেল, ২ কেজি আলু, ১ প্যাকেট বিস্কুট এবং মাস্ক বিতরণ করা হয়। মাস্কগুলি দান করেন মানব পাল এবং বাকি সামগ্রী আমাদের সদস্যদের দানে সংগৃহীত হয়। সদস্য ছাড়াও বস্তিবাসী স্থানীয় তরুণদের সক্রিয় সাহায্যে শিবির সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়।

আমরা ''কোভিড-১৯'' তহবিল গঠন করেছি। সবাইকে মুক্তহস্তে দান করার জন্য অনুরোধ জানাই। যে কোনো দান 80 G ধারায় ''ডোনেশন'' হিসাবে স্বীকৃত।

- বিজ্ঞাপন -

জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় ৭৬ বছর

পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)
২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরাভাষ ঃ ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪
যাদবপুর কেন্দ্র

বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন

৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড,
যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২
বাস ষ্টপ ঃ অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে
দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সন্ধ্যা ৭-৬টা)

কম খরচে
রোগনির্ণয়ে রক্ত পরীক্ষা

সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮টা-১১টা)

স্পেশালিষ্ট ক্লিনিক

পরামর্শ ১০০ টাকা + পি. আর. সি. সহায়তা ১০ টাকা

১) ডঃ উৎপল ব্যানার্জী (অর্থোপেডিক) এম.এস, ডি.এন.বি (অর্থো)
প্রতি মাসের ২য়/৪র্থ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে

২) ডঃ প্রদ্যুৎ শূর এম.ডি. (গাইনোকলজিস্ট) বুধবার, সন্ধ্যে ৭টা-৯টা

৩) ডঃ বি. বাউর-এম.ডি. (জেনারেল মেডিসিন)-বুধবার, ৩টা-৪টা

৪) ডঃ সৌম্য চ্যাটার্জি এম. ডি. (নিউরো-সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) মঙ্গলবার, ৮টা-৯টা

৫) ডঃ মৌমিতা চ্যাটার্জী এম.ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন), সোমবার, সন্ধ্যে ৮টা-৯টা

আবেদন _____

বিধান পল্লিতে নির্মিয়মান বৃদ্ধাবাসের জন্য অর্থ সাহায্য করুন।

Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Monalisa Printers, D/26 Katjunagar, Kolkata - 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- Bethune geriatrics@gmail.com. Website : bethunegeriatrics.in